ইকারুসের আকাশ

শামসুর রাহমান

কাব্যগ্রন্থ (১৯৮২)

অত্যন্ত অস্পষ্ট থেকে যায়

অক্ষর সাজিয়ে আমি অক্ষরের রূপে মজে আছি
সারা দিনমান আজো, কত নিদ্রাহীন রাত কাটে
প্রতিমা বানিয়ে অক্ষরের। ক্যালেন্ডারময় শাদা
দেয়ালের মুখোমুখি বসে থাকি প্রহরে প্রহরে।
কখনো হঠাৎ, যেন বিদ্যুতের স্পর্শে বিচলিত,
দাঁড়াই সটান ঘুরে। দেখেছি কি হরিণের লাফ,
অথবা চিতার দৌড় নাকি বলেভিয়ার জঙ্গলে
যে গুয়েভারার কাদামাখা হাত, অস্ত্রহীন, একা,
চির অস্তাচলে! বুঝি তাই বহু দেশে এখনো তো
হয়নি প্রকৃত সুর্যোদয়; স্বাধীনতা ফাঁসিকাঠে
ঝোলে দিকে দিএক, পিঠে চাবুকের কালশিটে
দাগ নিয়ে কুঁজো হয়ে পথ হাঁটে আহত বিবেক।
অক্ষর সাজিয়ে আমি, মনে হয়, রৌদেজ্যোৎস্নাময়

স্বাস্থ্যনিবাসের মতো কি একটা স্থাপন করেছি
আমার নিজের বাম পাশে। যে যাই বলুক আজ
এমন কন্টকময় পথে সোজা শিরদাঁড়া আর
যিশুর চোখের মতো গৌরবের আভাই সম্বল
আমার এবং দ্রুত শ্মশানের আগুন নেভাই।
অনেক সুন্দর নৌকো গহীন নদীর চোরা টানে
দূর নিরুদ্দেশে ভেসে যায়, দেখেছি কি দেয়ালের
শূন্য বুকে? মাঝে-মধ্যে নাগলতা আমাকে জড়িয়ে
ধরে আর অন্ধকারে স্বপ্নের মতই নিরিবিলি
আলখাল্লা কম্পমান। 'আয় তুই আমার হৃদয়ে'
ব'লে গাঢ় কণ্ঠস্বর আমাকে স্বপ্নের শুভ্রতায়
ডাকেন মৌলানা রুমি নাকি হো চি মিন, বোঝা দায়;
স্বপ্নে কিছু স্পষ্ট কিছু অত্যন্ত অস্পষ্ট থেকে যায়।

আবাসিক

কোনো ঘুমন্ত রূপসীর স্মিত হাসির মতো
এই বিকেল। হাওয়া এক পাল
হরিণের চাঞ্চল্য। সুসজ্জিত মঞ্চে
শোভা পাচ্ছে সেমিনারের সুলেখা শিরোনাম।
নগরের আবাসিক সমস্যা'। সভাকক্ষ
আস্তে-আস্তে ভ'রে উঠলো শ্রোতায়,
যেমন উৎসবের দিন কোনো কোনো বিরাট ঘর
ছেয়ে যায় ফুলের স্তবকে। মঞ্চ
সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি

এবং বক্তাবৃন্দ; কেউ-কেউ প্রৌঢ়, কেউবা যুবা।
মঞ্চস্থিত টেবিলে যুগল সৌখিন ফুলদানি আর এক গ্লাশ
টলটলে পানি। মঞ্চে উপবিষ্ট যাঁরা,
তাঁদের অধিকাংশের নিজস্ব ঘরবাড়ি আছে,
কারো-কারো একাধিক; একজন কি দু'জনের কোনো
বাড়ি আছে, অধিকাংশই ভাড়াটে বাড়ির বাশিন্দা;
কেউ কেউ থাকেন মেসবাড়িতে।
নগরের আবাসিক সমস্যা বিষয়ে
বক্তারা একে-একে বক্তৃতা দিলেন সকলেই। বক্তব্য তাঁদের
শাঁসালো, যুক্তিশাণিত। মঞ্চে ক্ষনে ক্ষণে
টিভি ক্যামেরার চমক আর ঠমক। ক্যামেরাম্যান আর
স্টাফ ফটোগ্রাফারদের
হঠাৎ আলোর ঝলকানির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সভাকক্ষ বারংবার
ঝলমলিয়ে উঠলো অজস্র কথার ফুলকিতে। কেউ কেউ
পাঠ করলেন দীর্ঘ প্রবন্ধ, তত্ত্বে তথ্যে ভুরভুরে।
প্রবন্ধ-পাঠকালীন কোনো-কোনো মুহূর্তে কেউ আড়চোখে
দেখে নিলেন শ্রোতাদের মুখমন্ডলে
ভাষণের প্রতিক্রিয়া; কেউবা হাততালির স্থায়িত্বের মাপকাঠিতে
নিজের জনপ্রিয়তা করলেন পরখ। তাদের
সুভাষিবলীর মুখে পড়লো ফুলচন্দন।
প্রধান অতিথি যখন ভাষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে
আসন ছেড়ে দাঁড়ালেন,
এগিয়ে গেলেন মাইক্রোফোনের দিকে, তখনই
বলা-কওয়া নেই, হঠাৎ একজন বালক
সবার অলক্ষ্যে শূন্য একটি চেয়ারে এসে
ব'সে পড়লো আনাহূত বিশেষ অতিথির মতো।

তার পরনে ছেঁড়া শার্ট, জন্মের পর যতোগুলো বছর
সে পাড়ি দিয়ে এসেছে, ততো বিচিত্র তালি তার
ময়লা হাফপ্যান্টে চুল উসকো-খুসকো। রাস্তার ধারে
ধুলোবালির ঘর বানাচ্ছিলো। সে রাস্তাই
নিবাস তার; দিনে ঘুরে বেড়ায় এক রাস্তা থেকে
অন্য রাস্তায় নির্বাসিত নাবালক রাজার মতো,
কুড়ায় বাতিল কাগজ। কারো
বাগানের বেড়া ডিঙিয়ে তোলে না গোলাপ
বাজখাঁই গলার ভয়ে। রাতে ঘুমায়
ফুটপাথে, দোকানের বন্ধ দরজার কাছে, কিংবা
টিনশেডের আশেপাশে। কখনো-কখনো স্বপ্নে
সে প্রবেশ করে অভ্রের তৈরি গীতময় এক অট্টলিকায়।
এখন সে আচমকা ঢুকে পড়েছে কৌতূহল বশে
এই সভাকক্ষে, প্রবেশাধিকারের
প্রশ্নটিকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে। নাকি সে
নগরের আবাসিক সমস্যা বিষয়ক সেমিনারে
যাচাই করতে এসেছে, এই যে সাত বছর আগে
ঘুঁটেকুড়ানী এক নারীর অন্তর্গত লতাগুল্ম ছিঁড়ে
সভ্যতার উগরে-দেয়া উচ্ছিষ্ট হিশেবে
সে চলে এসেছে পৃথিবীতে, এ-ঘটনা কতোটা যুক্তিসঙ্গত
এবং সমীচীন!

আরাগঁ তোমার কাছে

আরাগঁ তোমার কাছে কোনোদিন পরিণামহীন

এই পংক্তিমালা
জানিনা পৌঁছবে কিনা, তবু
তোমারই উদ্দেশে এই শব্দাবলী উড়ে যাক পেরিয়ে পাহাড়
অনেক পুরনো হ্রদ বনরাজি এবং প্রান্তর।
আমার এলসা আজ যৌবনের মধ্যদিনে একা
জীবনকে ফুলের একটি তোড়া ভেবে টেবে আর
গানের গুঞ্জনে ভরে কোথায় আয়নার সামনে চুল আঁচড়ায়,
দীর্ঘ কালো চুল, পা দোলায় কোন সে চত্বরে ব'সে অপরাহ্নে
কিংবা পড়ে ম্লান মলাটের কবিতার বই কিংবা কোনো
পাখির বাসার দিকে চোখ রেখে কী-যে দ্যাখে, ভাবে
আমি তা' জানিনা, শুধু তার স্বপ্নের ফোঁটার মতো
গাঢ় দু'টি আর সুরাইয়ের গ্রীবার মতন
গ্রীবা মনে পড়ে।
আরাগঁ আমার চোখে ইদানীং চালশে
এবং আমার নৌকো নোঙরবিহীন, তবু দেখি কম্পমান
একটি মাস্তুল দূরে, কেমন সোনালি।
অস্থিচর্মসার মাল্লা কবে ভুলে গেছে গান, কারো কারো
মাথায় অসুখ, ওরা বিড় বিড় ক'রে আওড়ায়
একটি অদ্ভুত ভাষা, মাঝে-মধ্যে দূর হ দূর ব'লে ঘুমের ভেতরে
কাদের তাড়ায় যেন, আমি শুধু দেখি
একটি মাস্তুল দূরে, কেমন সোনালি।
তরমুজ ক্ষেতের রৌদ্রে নগ্ন পদ সে থাকে দাঁড়িয়ে-
আমার কবিতা।
কখনো আমাকে ডেকে নিয়ে যায় বনবাদাড়ে যেখানে
সাপের সংগম দ্যাখে স্তম্ভিত হুতোম প্যাঁচা, যেখানে অজস্র
স্বপ্নের রঙের মতো ঘোড়া খুরে খুরে ছিন্ন ভিন্ন করে ঘাস ফুল

কখনো আমাকে ডাকে শহরতলীর বর্ষাগাঢ় বাসস্টপে
কখনো বা সিনেমার জনময়তায়,
আমার স্তিমিত জন্মস্থানে
এবং আমার ঘরে খেলাচ্ছলে আঙুলে ঘোরায়
একটি রুপালি চাবি, বাদামি টেবিল ক্লথ খোঁটে
চকচকে নখ দিয়ে-আমার কবিতা।
আবার কখনো তার সুপ্রাচীন তরবারির মতন বাহু
অত্যন্ত বিষণ্ন মেঘ, তার দুটি চোখ
ভয়ংকর অগ্নিদগ্ধ তৃণভূমি হয়।
যে-বাড়ি আমার নয়, অথচ যেখানে আমি থাকি
তার দরোজায়
কে যেন লিখেছে নাম কৃষ্ণাক্ষরে-অসুস্থ ঈগল।
পাড়াপড়শিরা বলে, মাঝে-মধ্যে মধ্যরাতে জীর্ণ
বাড়িটার ছাদ আর প্রাচীন দেয়াল থেকে তীব্র ভেসে আসে
নিদ্রাছুট রোগা ঈগলের গান, কী বিষণ্ন-গর্বিত গান।
আরাগঁ তোমার মতো আমিও একদা
শত্রুপরিবৃত শহরের হৃদয়ে স্পন্দিত হ'য়ে
লিখেছি কবিতা রুদ্ধশ্বাস ঘরে মৃত্যুর ছায়ায়
আর স্বাধীনতার রক্তাক্ত পথে দিয়েছি বিছিয়ে কত রক্তিম গোলাপ।
আরাগঁ তোমার কাছে লিখছি সে দেশ থেকে, যেখানে সুর্যের
চুম্বনে ফসল পাকে, রাঙা হয় গুচ্ছ গুচ্ছ ফল,
সজীব মুখের ত্বক রুটির মতোই ঝলসে যায়,
যেখানে বিশদ খরা, কখনো বা ভীষণ নির্দয় বানভাসি,
যেখানে শহুরে লোক, গ্রাম্যজন অনেকেই শাদাসিধে,
প্রায় বেচারাই, বলা যায়; আমাদের হালচাল
সাধারণ, চাল-চুলো অনেকের নেই।

আমাদের মাস ফুরোবার অনেক আগেই হাঁড়ি
মড়ার খুলির মতো ফাঁকা হ’য়ে যায়, দীর্ঘ দূরন্ত বর্ষায়
গর্তময় জুতো পায়ে পথ চলি, অনেকের জুতো নেই।
ধুতামি জানিনা, মোটামুটি
শাদাসিধে লোকজন আশেপাশে চরকি ঘোরে
এবং দু’মুঠো মোটা চালের ডালের জন্যে ক্ষুধার্ত আমরা।
ক্ষুধার্ত সত্তার পূর্ণ সূর্যোদয়, ভালোবাসা নাম্নী লাল
গোলাপের জন্যে
আরাগঁ তোমার কাছে লিখছি সে দেশ থেকে আজ,
যেখানে দানেশমন্দ ব’সে থাকে অন্ধকার গৃহকোণে বুরবক সেজে
জরাগ্রস্ত মনে, অবসাদ-কবলিত কখনো তাড়ায় আস্তে
অস্তিত্বের পচা মাংসে উপবিষ্ট মাছি।
আরাগঁ তবুও জ্বলে গ্রীষ্মে কি শীতে
আমাদের স্বপ্ন জ্বলে খনি-শ্রমিকের ল্যাম্পের মতো

ইকারুশের আকাশ

গোড়াতেই নিষেধের তর্জনী উদ্যত ছিলো, ছিলে
সুপ্রাচীন শকুনের কর্কশ আওয়াজে
নিশ্চিত মুদ্রিত
আমার নিজস্ব পরিণাম। যেন ধু ধু মরুভূমি
কিংবা কোনো পানা পুকুরে কি জন্মান্ধ ডোবায়
অস্তিত্ব বিলীন হবে কিংবা হবো সেই জলমগ্ন ভুল প্রত্ন
পরিশ্রমী, ধৈর্যশীল, উদ্যমপ্রবণ ধীবরের জাল যাকে

ব্যাকুল আনবে টেনে নৌকোর গলুইয়ে-
এইমতো ভয়ংকর সংকেত চকিতে
উঠেছিলো কেঁপে রুদ্ধ গোলকধাঁধায়।
আমিতো বারণ মেনে বিশ্রুত স্থপতি
ধীমান পিতার
পারতাম জলপাই আর বৃষমাংস খেয়ে,
পান ক'রে চামড়ার থলে থেকে উজ্জ্বল মদিরা
এবং নিভৃত কুঞ্জে তরুণীকে আলিঙ্গনে মোহাবিষ্ট ক'রে,
ধারালো ক্ষুরের স্পর্শসুখ নিয়ে প্রত্যহ সকালে
সাধারণ মানুষের মতো গোচারণ, শষ্যক্ষেত আর
সন্তান লালন ক'রে কাটাতে সময়।
পারতাম সুহৃদের সঙ্গে প্রীতি বিনিময়ে
খুশি হতে, তৃপ্তি পেতে পাতার মর্মরে,
বনদোয়েলের গানে, তামাটে দুপুরে
পদরেখা লাঞ্ছিত জঙ্গলে
নিজেকে বিযুক্ত ক'রে মধু আহরণে।
কী-যে হলো, অকস্মাৎ পেরিয়ে গোলকধাঁধা পিতৃদত্ত ডান।
ভর ক'রে কিছুক্ষণ ওড়ার পরেই
রৌদ্রের সোনালি মদ আমার শিরার
ধরালো স্পর্ধার নেশা। শৈশবে কৈশোরে কতদিন
দেখেছি পাখির ওড়া উদার আকাশে। ঈগলের
দুর্নিবার ঊর্ধচারী ডানার চাঞ্চল্যে ছিলো সায়
সর্বদা আমার, তাই কামোদ্দীপ্তা যুবতীর মতো
প্রবল অপ্রতিরোধ্য আমার উচ্চাভিলাষ আমাকে অনেক
উঁচুতে মেঘের স্তরে স্তরে
রৌদ্রের সমুদ্রে নিয়ে গেলো। দ্বিধাহীন আমি উড়ে

গেলাম সূর্যের ঠোঁটে কোনো রক্ষাকবচবিহীন
প্রার্থনার মতো।
কখনো মৃত্যুর আগে মানুষ জানে না
নিজের সঠিক পরিণতি। পালকের ভাঁজে
সর্বনাশ নিতেছে নিশ্বাস
জেনেও নিয়েছি বেছে অসম্ভব উত্তপ্ত বলয়
পাখা মেলবার, যদি আমি এড়িয়ে ঝুঁকির আঁচ
নিরাপদ নিচে উড়ে উড়ে গন্তব্যে যেতাম তবে কি পেতাম এই অমরত্বময় শিহরণ?
তবে কি আমার নাম স্মৃতির মতন
কখনো উঠতো বেজে রৌদ্রময় পথে জ্যোৎস্নালোকে
চারণের নৈসর্গিক, স্বপ্নজীবী সান্দ্র উচ্চারণে?
সমগ্র জাতির কোন কাজে লাগবে না
এই বলিদান, শুধু অভীপ্সার ক্ষণিকের গান
গেলাম নিভৃতে রেখে ঝাঁ ঝাঁ শূন্যতায়।
অর্জন করেছি আমি অকাল লুপ্তির বিনিময়ে
সবার কীর্তনযোগ্য গাথা,
যেহেতু স্বেচ্ছায়
করেছি অমোঘ নির্বাচন
ব্যাপ্ত, জ্বলজ্বলে, ক্ষমাহীন রুদ্র নিজস্ব আকাশ।

ইলেকট্রার গান

শ্রাবণের মেঘ আকাশে আকাশে জটলা পাকায়
মেঘময়তায় ঘনঘন আজ একি বিদ্যুৎ জ্বলে।

মিত্র কোথাও আশেপাশে নেই, শান্তি উধাও;
নির্দয় স্মৃতি মিতালী পাতায় শত করোটির সাথে।
নিহত জনক, ত্র্যাগামেমনন্, কবরে শায়িত আজ।
সে কবে আমিও স্বপ্নের বনে তুলেছি গোলাপ,
শুনেছি কত যে প্রহরে প্রহরে বনদোয়েলের ডাক।
অবুঝ সে মেয়ে ক্রাইসোথেমিস্ আমার সঙ্গে
মেতেছে খেলায়, কখনো আমার বেণীতে দিয়েছে টানে।
নিহত জনক, ত্র্যাগামেমনন্, কবরে শায়িত আজ।
পিতৃভবনে শুনেছি অনেক চারণ্যের গাথা,
লায়ারের তারে হৃদয় বেজেছে সুদূর মদির সুরে।
একদা এখানে কত বিদূষক প্রসাদ কুড়িয়ে
হয়েছে ধন্য, প্রধান কক্ষ ফুলে ফুলে গেছে ছেয়ে।
নিহত জনক, ত্র্যাগামেমনন্, কবরে শায়িত আজ।
প্রজাপতি-খুশি ফেরারী এখন, বিষাদ আমাকে
করেছে দখল; কেমন বিরূপ কুয়াশা রেখেছে ঘিরে।
রক্তের ডাকে দিশেহারা আমি ঘুরি এলোমেলো,
আমার রাতের শয্যায় সুধুক কান্নার স্বাক্ষর।
নিহত জনক, ত্র্যাগামেমনন্, কবরে শায়িত আজ।
সেইদিন আজো জ্বলজ্বলে স্মৃতি, যেদিন মহান
বিজয়ী সে বীর দূর দেশ থেকে স্বদেশে এলেন ফিরে।
শুনেছি সেদিন জয়ঢাক আর জন-উল্লাস;
পথে-প্রান্তরে তাঁরই কীর্তন, তিনিই মুক্তিদূত।
নিহত জনক, ত্র্যাগামেমনন্, কবরে শায়িত আজ।
নন্দিত সেই নায়ক অমোঘ নিয়তির টানে
গরীয়ান এক প্রাসাদের মতো বিপুল গেলেন ধ্বসে।
বিদেশী মাটিতে ঝরেনি রক্ত; নিজ বাসভূমে,

নিজ বাসগৃহে নিরস্ত্র তাঁকে সহসা হেনেছে ওরা।
নিহন জনক, ত্র্যাগামেমনন্, কবরে শায়িত আজ।
আড়ালে বিলাপ করি একা-একা, ক্ষতার্ত পিতা
তোমার জন্যে প্রকাশ্যে শোক করাটাও অপরাধ।
এমন কি, হায়, আমার সকল স্বপ্নেও তুমি
নিষিদ্ধ আজ; তোমার দুহিতা একি গুরুভার বয়!
নিহত জনক, ত্র্যাগামেমনন্, কবরে শায়িত আজ।
মাথার ভেতরে ঝোড়ো মেঘ ওড়ে, আমি একাকিনী
পিতৃভবনে আমার কেবলি সোক পালনের পালা।
পিতৃহন্তা চারপাশে ঘোরে, গুপ্তচরের
চোখ সেঁটে থাকে আমার ওপর, আমি নিরুপায় ঘুরি।
নিহত জনক, ত্র্যাগামেমনন্, কবরে শায়িত আজ।
কখনো কখনো মাঝরাতে আমি জেগে উঠে শুনি
পায়ের শব্দ, আস্তাবলের ঘোড়ার আর্তনাদ।
শিকারী কুকুর ঘরের কপাট ঠ্যালে অবিরত,
আমার রক্তে দাঁত-নখ তার সিক্ত করতে চায়।
নিহত জনক, ত্র্যাগামেমনন্, কবরে শায়িত আজ।
যতদিন আমি এই পৃথিবীতে প্রত্যহ ভোরে
মেলবো দু'চোখ, দেখবো নিয়ত রৌদ্র-ছায়ার খেলা,
যতদিন পাবো বাতাসের চুমো, দেখবো তরুণ
হরিণের লাফ, ততদিন আমি লালন করবো শোক।
নিহত জনক, ত্র্যাগামেমনন্, কবরে শায়িত আজ।
অন্ধের দেশে কে দেবে অভয়? ভাই পরবাসে;
যে নেবে আমার মহা দায়ভাগ, তেমন জীবনসঙ্গী কই?
কেমন ছাদের নিচে সহোদর ছেঁড়ে তার রুটি?
কোন্ প্রান্তরে ওড়াচ্ছে ধূলি ওরেস্টেসের ঘোড়া?

নিহত জনক, ত্র্যাগামেমনন্, কবরে শায়িত আজ।
কান পেতে থাকি দীপ্র কণ্ঠ শোনার আশায়,
কাকের বাসায় ঈগলের গান কখনো যায় কি শোনা?
ক্রাইসোথেমিস, অবুঝ তন্বী, দূরে সরে থাকে,
বিকচোন্মুখ শরীরে এখন লায়ারের ঝংকার।
নিহত জনক, ত্র্যাগামেমনন্, কবরে শায়িত আজ।
আমার উপমা দাবানলে-পোড়া আর্ত হরিণী;
মৃতের মিছিল খুঁজি দিনরাত, আঁধারে লুকাই মুখ।
করতলে কত গোলাপ শুকায়, ঝরে জুঁই, বেলী;
আমার হৃদয়ে প্রতিশোধ জ্বলে রক্তজবার মতো।
নিহত জনক, ত্র্যাগামেমনন্, কবরে শায়িত আজ।
পারবো না আমি হানতে কখনো ক্রুর তরবারি,
যদিও ক্ষুব্ধ হৃদয় আমার, প্রতিশোধ জপমালা।
আত্মশুদ্ধি ঘাট যায় যদি দেখি সন্ধ্যায়
উড়ন্ত দু'টি সারস কী সুখে নদীটি পেরিয়ে যায়।
নিহত জনক, ত্র্যাগামেমনন্, কবরে শায়িত আজ।
যে যেমন খুশি যখন তখন বাজাবে আমাকে
নানা ঘটনায় ষড়জে নিখাদে, আমি কি তেমন বাঁশি?
কন্টকময় রক্ত পিপাসু পথে হাঁটি একা;
আমার গ্রীবায় এবং কণ্ঠে আগামীর নিশ্বাস।
নিহত জনক, ত্র্যাগামেমনন্, কবরে শায়িত আজ।

একটি গাধাকে দেখি

একটি গাধাকে আমি প্রতিদিন দেখি আশে পাশে,

শহরে নিঃসঙ্গ ভিড়ে,
আমার সান্নিধ্যে দেখি রোজ
আওলাদ হোসেন লেনের মোড়ে, বাবুর বাজারে,
ইসলামপুরে, বঙ্গবন্ধু অ্যাভেন্যুর ফুটপাথে, সিদ্ধেশ্বরী,
পলাশী বেইলী রোডে, বুড়িগঙ্গা নদীটির তীরে
মিটফোর্ড হাসপাতালের কাছে, ধানমন্ডি লেকের ওপারে।
হঠাৎ কখনো রমনা পার্কে তার দেখা পাওয়া যায়,
একটি গাধার সঙ্গে ঘুরে ফিরে দেখা হয় প্রত্যহ আমার।
তাকে দেখে মনে হয়, যেন দার্শনিক, অস্তিত্ব কি অনস্তিত্ব
নিয়ে চিন্তাবিষ্ট খুব চলেছেন একা, তাবৎ বস্তুর প্রতি
বড়ো উদাসীন;
এবং কর্তব্যাক্লান্ত ট্রাফিক পুলিশ, ক্রুশচিহ্ন আইল্যান্ডে,
বেলা অবেলায় তাকে ঈষৎ মুচকি হেসে পথ ছেড়ে দ্যায় বার বার।
গাধাটির কথা বলিহারি, কিছুই দেখে না যেন
চোখ মেলে, পথ হাঁটে একা-একা, বিস্তর ধূলায়
আরবী রেখার মতো নক্শা
তৈরী ক'রে অচেতনভাবে। কাকে বলে আয়কর ফাঁকি দেয়া,
সুরক্ষিত বাক্সের ভেতর থেকে ব্যালট পেপার চুরি আর
টিকিটবিহীন রেল ভ্রমণের সাধ মেটানো, বস্তুত জানে না সে।
কখনো ঘেসেড়া ডাকে, খচ্চরের ভিড় লুব্ধতায়
তার খুব অন্তরঙ্গ হ'তে চায়। মনে পড়ে রজকের পৃষ্ঠপোষকতা
ছিলো বহুদিন, আজ রজকের ঘাট থেকে দূরে,
বহুদূরে চলে এসেছে সে, স্মৃতি ছেঁড়া দূববার মতন ওড়ে,
মাঝে মাঝে অপরাহ্নে ঘাসের সৌন্দর্য দেখে ভালো লাগে তার।
কৃপাপ্রার্থী নয় কারো, তবু বিশ্বাসঘাতকতার চুমো নিয়ে
গালে গূঢ় ডুমুর ফুলের কাছে কামগন্ধহীন রজকিনী প্রেম চায়।

তাঁর চক্ষুদ্বয়ে দ্বিপ্রহরে চিলডাকা আকাশের
প্রতিধ্বনি, কবিতার লাইনের মতো অনুকরণকাতর
অবরুদ্ধ নগরীর শব্দাবলী, দূর অনার্য রাত্রির জ্যোৎস্না-বিহ্বলতা,
মায়া কাননের ফুল, পরীর দেশের
রহস্যময়তা আর নিগৃহীত কোবিদের মেধার রোদ্দুর
মাথার ভেতরে তার এজমালী তত্ত্বের তথ্যের দীপাবলী,
আত্তারের সহজিয়া গল্প ছলে সুসমাচারের স্নিগ্ধ কোমল গান্ধার।
আসিসির সন্ত ফ্রান্সিসের মতো নিজেকে অভুক্ত রেখে কৃশ
হয়, হাঁটে চরাচরব্যাপী ঝড়ে, বৃষ্টিপাতে আর
তুষামৌলির দিকে দৃষ্টি রেখে পর্বতারোহণে মাতে, সঙ্গীহীনতায়
নিজের সঙ্গেই কথা বলে বারংবার। মুখমন্ডলের
রুক্ষতা ক্রমশ বাড়ে, দাঁতে ক্ষয়, পায়ে মস্ত ক্ষত,
শুধু চক্ষুদ্বয় তার সন্তের চোখের মতো বড়ো জ্বলজ্বলে-
যা উপোসে, কায়ক্লেশে, ক্রমাগত উর্ধ্বারোহণে এমন হয়।
কুষ্ঠরোগীদের ক্ষতে হাত রাখে, চুমো খায় গলিত ললাটে
দ্বিধাহীন বারংবার, যাত্রা করে দুর্ভিক্ষের প্রতি,
মড়কের প্রতি, নানাদেশী শীর্ণ উদ্বাস্তুর প্রতি,
বিকলাঙ্গ শিশুদের প্রতি, অন্ধের শিবিরে আর
মৃত্যুপথযাত্রী জীর্ণ পতিতার প্রতি,
যোজন যোজনব্যাপী কাঁটাতর, নিযাতিত রাজবন্দীদের প্রতি,
যাত্রা করে বধ্যভূমি আর ফাঁসির মঞ্চের প্রতি।
এবং প্রকৃত পরী তার পদ্মপাতা-কানে চুমো খায়,
কোজাগরী পূর্ণিমায়, ব্যাকুল সে খোঁজে সেই চুম্বনের মানে।

কথার জেরুজালেম

এখন বলার কিছু নেই আর তাই থাকি আপাতত
চুপচাপ, প্রায় বোবা, বলা যায়। তুমিও আগের
মতো কথা পুষ্পসারে দাওনা ভরিয়ে ক্ষণে ক্ষণে
আমার প্রহর আজ। যদিও কখক নই নিপুণ, তুখোড়,
তবু ছিলো দীর্ঘস্থায়ী কথোপকথন
আমাদের; ছিলো, মনে পড়ে, প্রহরে প্রহরে।
এখন আমার চোখ কথা বলে, প্রতিটি আঙুলে
সযত্নে সাজায় শূন্যে কথামালা, আমার বুকের
রোমারাজি কথা হয়ে ফোটে থরে থরে
পাঁজরে পাঁজরে সর্বক্ষণ
কথার পিদিম জ্বলে,
হৃদয়ের গাঢ় অন্ধকার
অন্য মানে পায়, তাই সহজে খুলি না মুখ আর।
এখনো বাসিন্দা আমি স্বপ্নময় জেরুজালেমের।
সেখানে নিঃশব্দে পথ চলি, কত যে গলির মোড়
ফুলে ফুলে ছেয়ে থাকে, দীঘল চুলের
ছায়া নামে মুখের ওপর
জোয়্যরি জ্যোৎস্নায়।
রাস্তায় কি ঘরে কেউ বলে না কখনো কথা, শুধু
সুরে সুরে জেগে থাকে আদিগন্ত বাখের উৎসব।
স্বপ্ন-নগরীতে, বলো, কথার কি দরকার? বরং
যুগ যুগ চেয়ে থাকা যায়
কারো চোখে চোখ রেখে কথার চেয়েও খুব গভীর ভাষায়,
হৃদয় জেরুজালেম জেনে

হাঁটা যায় নানান শতকে,
কারো হাত ধ’রে স্বপ্নময়
জেরুজালেমের পথে। শত ভুল শুধরে নেয়া যায়
একটি চুম্বনে,
মে চুম্বনে পড়বে ছায়া দীর্ঘ মিনারের জলপাই পল্লবের।
এখন তো মেঘমালা, গাছের সতেজ পাতা, বৈশাখী রোন্দুর,
শ্রাবণের বৃষ্টিধারা, পাখির অমর্ত্য গান আমাদের হয়ে
প্রহরে প্রহরে
আমাদের দুজনের হয়ে
করবে রচনা নয়া কথার জেরুজালেম। কে বলেছে?
একজন কেউ, আছে যার খুব স্বপ্নবিলাসী উদাত্ত পাখা।

কবির অশ্রুর চেয়ে দামী

আমি কি অজ্ঞাতবাসে আছি? এ-রকম থেকে যাবো
গোপনীয় মনোকষ্টে ডুবে বহুদিন দলছাড়া?
কীট-পতঙ্গের সঙ্গে উচ্চারণহীন মেলামেশা,
বিষণ্ন বিকেলে হ্রদে ভাসমান প্রেমিকের জামা,
আর ঊর্ণাজালের মতই ঝোপঝাড়ে তেজী আলো,
মাথার ওপর উড্ডয়নপরায়ণ একা দীর্ঘপদী পাখি-
ভাবি আজো নিসর্গের পৃষ্ঠপোষকতা
রয়েছে অটুট। গোধুলিতে খোলামেলা
ঢিবির ওপরে ব’সে দেখি জীবনের ঢ্যাঙা ছিরি!
জীবন আমার হাতে কোন সে ঠিকানা গুঁজে দিয়ে
দেখিয়েছে খোলা পথ; পথে

তৃণ ছিলো, কাঁটাঝোপ ছিলো, ছিলো সাঁকো,
হরিণের লাফ ছিলো, উজ্জ্বল সাপের
হিস্‌হিস্‌ ছিলো, কিছু কাটাকুটি, কিছু ভুল ছিলো-
ভাবতে-ভাবতে হাঁটি, কায়ক্লেশে হাঁটি,
কখনো নিঝুম ব'সে থাকি পথপ্রান্তে, ক্ষয়ে-যাওয়া
দাঁতে ছায়া চিবোতে-চিবোতে দিন যায়।
দিন যায়,
কখনো-কখনো খুব সহজে যায় না।
কোনো-কোনো ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই কষ্ট পাই,
বিষণ্ণতা ব্যেপে আসে শ্রাবণের মেঘের ধরনে,
উদ্যানের পাশে
কী এক সৌন্দর্য ফৌত হয়ে প'ড়ে থাকে, মনে হয়
পুরোনো কবর থেকে কোনো পূর্বপুরুষ আমার
বেরিয়ে এলেন পৌরপথে, প্রতিকার চেয়ে-চেয়ে
পুনরায় ত্বক-মাংস তাঁর খ'সে যায়, খ'সে যায়,
বুঁজে আসে কবরের চোখ। দিন খুব
দীর্ঘ লাগে, দীর্ঘশ্বাসে-দীর্ঘশ্বাসে প্রহর উদাস।
মাঝরাতে যখন ভীষণ একা আমি,
যখন আমার চোখে ঘুম নেই একরত্তি, আমি
বিপর্যস্ত বিছানায় প'ড়ে আছি ক্রুশের ধরেন,
তখন অদ্ভুত কণ্ঠস্বরে
কে এক নৃমুন্ডধারী অশ্ব এসে বলেঃ
শোনো হে তোমার
নিজের শহরে আজ আমাদের রাজ
পাকাপোক্ত হলো;
দ্যাখো চেয়ে আমাদের সংকেতবহুল

পোস্টারে-পোস্টারে
ছেয়ে গ্যাছে শহরের প্রতিটি দেয়াল আর ছায়া-কেবিনেটে
জ্যোতিশ্চক্রগুলি নৃত্যপর, কবিসংঘ এই অশ্ব সমাজের,
মানে আমাদের সমর্থনে দিনরাত্রি
বেহাল কাটায় দীর্ঘ স্তোত্র রচনায়।
তোমার শহরে, শোনো, একটিও ভিক্ষুক নেই আর।
হাসপাতালের সব বেড খালি, কেননা এখন
আর রোগী নেই কেউ। পাগলাগারদও আজ বাশিন্দাবিহীন,
অতিশয় পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকগুলো কুচকাওয়াজের ঢঙে
দিব্যে হেঁটে যায়
নতুন মুদ্রার মতো চকচকে রাস্তায়-রাস্তায়!
বাছা-বাছা যুক্তিবাদী রাজনীতিবিদ
পরিবর্তনের গূঢ় পতাকা পকেটে পুরে নব্য খোয়ারিতে
ছায়াস্নিগ্ধ বনভোজনের চমৎকার
মানুসরুটি খেয়ে
দাঁত খুঁটছেন ঘন-ঘন আর মাঝে-মাঝে
দরাজ গলায় গান ধরেন পার্টিতে ফের অকস্মাৎ ঘুমিয়ে পড়েন
প্রতারক জ্যোৎস্নার কার্পেটে।
ফলস্ ত্র্যালার্ম শুনে ভয় পেও না বেহুদা, ছুটে
যেও না বাইরে, চোখ-কান বুঁজে প'ড়ে থেকো নিজস্ব শয্যায়
বিপদকে গ্রেপ্তার করেছি আমরা, বিপুল ধ্বংসকে
পাঠিয়েছি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে, তোমার নিজের
শহরকে খলখলে রক্ষিতার মতো সাজিয়ে দিয়েছি
আপাদমস্তক অহংকারী অলংকারে।
আমার ব্যর্থতা
কবরখানার হল্‌দে ঘাসে নাঙা সন্ন্যাসীর মতো

শুয়ে থাকে সাবলীল,
আমার ব্যর্থতা ফণিমনসার মতো তীক্ষ্ম অহংকারে
রৌদ্রজ্যোৎস্না পোহার নিয়ত,
আমার ব্যর্থতা টাওয়ারের প্রতি বাড়িয়ে দু'হাত
ধুলোয় গড়াতে থাকে কখনো-বা শিস দিতে-দিতে
চলে যায় নিরুদ্দেশে, বেকার যুবার মতো ছেঁড়া জুতো পায়ে
পথে-পথে ঘোরে,
সর্বস্বান্ত নবাবের মতো চেয়ে থাকে সূর্যাস্তের দিকে বড়ো
উদাসীন, গলির দোকান থেকে সিগারেট কেনে ধারে আর
আমার ব্যর্থতা ব্যর্থ কবির ধরনে
খুব হিজিবিজি কাটাকুটির অরণ্যময় কালো খাতা খুলে
ব'সে থাকে, সিগারেট ঠোঁটে, ছাই ঝ'রে যায়, শুধু
ছাই ঝ'রে যায়।
এইসব কথা লিখে অধিক রাত্তিরে কবি ধূসর বালিশে
মুখ চেপে কাঁদে, রক্তে মাংসে হাড়ে ও মজ্জায় ঝরে
কান্না ঝরে অবিরল।
কবির অশ্রুর চেয়ে দামী মায়াময় অন্য কিছু আছে কি জগতে?

ডেডেলাস

না, আমি বিলাপ করবো না তার জন্যে, যে আমার
নিজের একান্ত অংশ, স্বপ্ন, ভবিশ্যত; যাকে আমি
দেখেছি উঠোনে হাঁটি-হাঁটি পা-পা হেঁটে যেতে
আনন্দের মতো বহুবার। যখন প্রথম তার
মুখে ফুটেছিলো বুলি, কি যে আনন্দিত

হয়েছি সেদিন আমি; যখন জননী তার ওকে
বুকে নিয়ে চাঁদের কপালে চাঁদ আয় টিপ দিয়ে
যা ব'লে পাড়াতো ঘুম, আমি
স্বর্গসুখ পেয়েছি তখন।
কতদিন ওকে
নিজেই দিয়েছি গ'ড়ে পুতুল এবং
বসেছে সে আমার আপনকার পিঠে, ক্ষুদে অশ্বারোহী।
আমার স্নেহের ঘরে সে উঠেছে বেড়ে
ক্রমান্বয়ে,
আজ সে শুধুই স্মৃতি, বেদনার মতো বয়ে যায়
আমার শিরায়।
কোন কোনদিন স্থাপত্যের গূঢ় সুত্র-বিষয়ক চিন্তার সময়
অকস্মাৎ দেখি সে দাঁড়িয়ে আছে আমার শয্যার পাশে
সুকান্ত তরুণ;
ইকারুস ইকারুস ব'লে ডাকলেই উজ্জীবিত
দেবে সাড়া। কখনো বা মনে হয় আমার নিজের
হাতে গড়া ডানা নিয়ে দেবে সে উড়াল
দূর নীলিমায়
অসম্ভব উঁচুতে আবার।
না, আমি বিলাপ করবো না তার জন্যে, স্মৃতি যার
মোমের মতন গলে আমার সত্তায়, চেতনায়।
সর্বদা সতর্ক আমি, বিপদের গন্ধ সিদ্ধ, তাই
বুঝিয়েছিলাম তাকে সাবধানী হ'তে,
যেন সে না যায় উড়ে পেরিয়ে বিপদসীমা কখনো আকাশে।
কিন্তু সে তরুণ, চটপটে, ঝকঝকে, ব্যগ্র অস্থির, উজ্জ্বল,
যখন মেললো পাখা আমার শিল্পের ভরসায়,

গেলো উড়ে ঊর্ধে, আরো ঊর্ধে, বহুদূরে,
সূর্যের অনেক কাছে প্রকৃত শিল্পীর মতো সব
বাধা, সতর্কতা
নিমেষে পেছনে ফেলে, আমি
শংকিত অথচ মুগ্ধ রইলাম চেয়ে
তার দিকে, দেখলাম তাকে
পরিণাম বিষয়ে কেমন
উদাসীন, ক্রুর রোদ্রঝলসিত, সাহসী, স্বাধীন।
না আমি বিলাপ করবো না তার জন্যে, স্মৃতি যার
মোমের মতন গলে আমার সত্তায়, চেতনায়।
যেন আমি এখন উঠেছি জেগে অন্তহীন নির্জন সমুদ্রতীরে একা
আদিম বিস্ময় নিয়ে চোখে। আস্তে আস্তে মনে পড়ে
নানা কথা, মনে পড়ে বাসগৃহ, বহুদূরে ফেলে-আসা কত
স্থাপত্যের কথা আর নারীর প্রণয়। মনে পড়ে,
আমার সন্তান যেতো পাখির বাসার খোঁজে, কখনো কখনো
দেখতো উৎসুক চেয়ে আমার নিজের
বাটালি ছেনির চঞ্চলতা। মনে পড়ে
দেবতার মতো স্তব্ধ আলোচ্ছ্বাস, তরুণের ওড়া
ভয়ংকর অপরূপ দীপ্তিময়তায়। তার পতন নিশ্চিত
বলেই হয়তো আমি তাকে আরো বেশি ভালোবেসেছি তখন।
পিতা আমি, তাই সন্তানের আসন্ন বিলয় জেনে
শোকবিদ্ধ, অগ্নিদগ্ধ পাখির মতন দিশাহারা;
শিল্পী আমি, তাই তরুণের সাহসের ভস্ম আজ
মৃত্যুঞ্জয় নান্দনিক সঞ্চয় আমার।

নিজের কবিতা বিষয়ে কবিতা

আমার কবিতা নিয়ে রটনাকারীরা আশেপাশে
নানা গালগল্প করে। কেউ বলে আমার কাব্যের
গোপনাঙ্গে কতিপয় বেঢপ জড়ুল জাগরুক,
ওঠেনি আক্কেল দাঁত আজো তার, বলে কেউ কেউ।
আমার কবিতা নাকি বাউন্ডুলে বড়ো, ফুটপাথে
ঘোরে একা একা কিংবা পার্কের বেঞ্চিতে ব'সে থাকে,
ইন্দ্রিয়বিলাসে মজে বন্ধ কুঠুরিতে, মাঝে-মাঝে
শিস দেয়; আমার কবিতা খুব বেহুদা শহুরে!
একরত্তি কান্ডজ্ঞান নেই তার, সবার অমতে
সোৎসাহে চাপিয়ে গায়ে আজব জ্যাকেট, কেয়াবাং,
সুনীল লন্ঠন হাতে দিনদুপুরেই পর্যটক
এবং অভ্যাসবশে ঢোকে সান্ধ্য মদের আড্ডায়।
মদের বোতল রুক্ষ গালে চেপে অথবা সরোদে
চুমু খেয়ে অস্তিত্বহীনতা বিষয়ক গান গায়,
এবং মগজে তার নিষিদ্ধ কথার ঝাঁক ওড়ে
মধুমক্ষিকার মতো সকালে কি রাত বারোটায়।
আমার কবিতা অকস্মাৎ হাজার মশাল জ্বেলে
নিজেই নিজের ঘর ভীষণ পুড়িয়ে দেখে নেয়
অগ্নুৎসব; কপোতীর চোখে শোক; এদিকে নিমেষে
উদ্বাস্তু গৃহ দেবতা, কোথাও করবে যাত্রা ফের।
বিদ্যের জাহাজ দ্রুত চৌদিকে রটিয়ে দেয়, 'ওর
পদ্যটদ্য এমনকি ইকেবানা নয়, এইসব
আত্মছলনার অতি ঠুনকো পুতুল-টিঁকবে না,
ভীষণ গুঁড়িয়ে যাবে কালের কুডুলে শেষমেষ।

যখন পাড়ায় লাগে হঠাৎ আগুন ভয়াবহ,
আমার কবিতা নাকি ঘুমোয় তখনও অবিকল
গাছের গুঁড়িয়ে মতো ভাবলেশহীন। আর ঘুম
ভাঙলেও আত্মমগ্ন বেহালায় দ্রুত টানে ছড়!
আমার কবিতা করে বসবাস বস্তিও শ্মশানে,
চাঁড়ালের পাতে খায় সূর্যাস্তের রঙলাগা ভাত,
কখনো পাপিষ্ঠ কোনো মুমূর্ষ রোগীকে কাঁধে বয়ে
দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছে যায় আরোগ্যশালায়।
আমার কবিতা পথপ্রান্তে দুঃখীর চোখের মতো
চোখ মেলে চেয়ে থাকে কার পায়ের ছাপের দিকে,
গা ধোয় ঝরনার জলে। স্বপ্ন দ্যাখে, বনদেবী তার
ওষ্ঠে ঠোঁট রেখে হু হু জ্বলছেন সঙ্গম-লিপ্সায়!

বসতিতে, মনীষায়

আজকাল বিছানায় বড় বেশি শুয়ে থাকে একা,
বালিশে অনেকক্ষণ মুখ গুঁজে সময় যাপন
করে, কড়িকাঠ গোনে। বাড়িটা পুরনো, নড়বড়ে;
বুড়ো কাকাতুয়ার বিবর্ণ
পালকের মতো রঙ দেয়ালে অস্পষ্ট। পলেস্তরা
খসে পড়ে মাঝে-মধ্যে; প্রাচীন পদ্যের ঋদ্ধ পংক্তির মতন
কি যেন গুমরে ওঠে ক্ষয়ে-যাওয়া বাঘছালে ইঁদুরের দৌড়
কাঠের চেয়ারে শাদা বেড়ালের স্বপ্নাশ্রিত মাথা,
খবর কাগজ ঘোর উন্মাদের স্মৃতির মতন

লুটোয় মেঝেতে আর দিন যায়, দীর্ঘ বেলা যায়।
রোদের জঙ্গলে হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে
এখন সে গা-গতর এলিয়ে দিয়েছে বিছানায়
রৌদ্রদগ্ধ শ্রমিকের মতো।
সে কি একবুক অভিমান নিয়ে শুয়ে থাকে, নাকি
সত্তাময় অপমান নিয়ে হতে চায় আত্মঘাতী?
নানান ফলের প্রতি তার দুর্বলতা আছে ব'লে
শিয়রে সাজিয়ে রাখে সযত্নে অলীক ফলমূল। আলস্যের
ভায়োলেট মখমলে গুটিসুটি পড়ে থাকে; চোখের পাতায়
ঘুম নয়, কিছু তন্দ্রা লেগে থাকে মোহের মতন।
স্বপ্নের টানেলে ঘোরে নিরুদ্দেশে, নিজেকে সংশয়মুক্ত রেখে
তারই করতলে রাখে মাথা খুব নিটোল আস্থায়
যে তার অকুণ্ঠ পিঠে আমূল বসিয়ে দেবে ছোরা সুনিশ্চিত।
কখনো হঠাৎ তার তন্দ্রার ঝালর কাঁপে, অলিতে-গলিতে
রাত্রিদিন নানা কলরব, ছদ্মবেশী শজারুর ভিড় বাড়ে
ক্রমাগত আশেপাশে। প্রকৃত ধর্মের চেয়ে ধর্ম-কোলাহলে
অত্যন্ত মুখর আজ শহর ও গ্রাম। বিশ্বযুদ্ধে নেই কারো সায় আর,
তবু অতিকায় কালো রাজহাঁসের মতন ছায়া ফেলছে সমর
বসতিতে, মনীষায়, সভ্যতার মিনারে-মিনারে।

বহুদিন পর একটি কবিতা

বহুদিন পর একটি কবিতা লেখার জন্যে কদম ফুলের মতো
শিহরিত আমার স্নায়ুপুঞ্জ অর্থাৎ আমি ফের সুর দড়ির পথিক,

আমার দিকে নিবদ্ধ হাজার হাজার উৎসুক চোখ।
যতক্ষণ দড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আছি চমৎকার,
খেলা দেখাতে পারছি হরেক রকম,
ততক্ষণ দশদিক-কাঁপানো করতালি
আর পা হড়কে পড়লেই থমথমে নিস্তব্ধতা, রি রি ধিক্কার।
কিছুকাল হাঁটেনি যে মানুষ, সে যেমন একটু পা চালিয়ে
পরখ করে নেয় নিজের চলৎশক্তি,
তেমনি হড়বড়িয়ে এই লিখে ফেলছি পংক্তিমালা; অথচ
এতদিন পর বাস্তবিকই বাক্যগুলি সযত্নে সাজিয়ে গুছিয়ে নেয়া দরকার।
কে না জানে কবিতার একটি প্রকৃত পংক্তি রচিত হবার আগে
বহু বাক্য অস্ত যায়, ঝ'রে যায় অনেকানেক
উপমার কুঁড়ি আর দু'টি বাক্যের ব্যবধানে
দীর্ঘস্থায়ী হয় ঈগল আর পাহাড়ি গিরগিটর বিবাদ,
ঝিলের ধারে পড়ে থাকে
বাঘ-তাড়িত ত্রস্ত হরিণের খাবলা খাবলা মাংস,
থাকে ঝোপঝাড়ের আড়ালে কম্পমান খরগোশ; কখনো সখনো
কবরের স্তব্ধতাও, কখনো বা নবজাতকের জন্মধ্বনি।
এখন আমি হাতে কলম তুলে নিয়েছি
এমন একটি কবিতা লেখার জন্যে, যার ডান গালে টোল পড়ে সুন্দর,
যার চোখ দূর নীলিমায় সন্তরণশীল,
যার পরনে নীল শাড়ি, মেঘলা খোঁপায় রক্তজবা,
যার নখ সূর্যোদয়ের রঙে সজীব,
যার কণ্ঠস্বরে রাত্রির মমতা, যুগল পাখির
শব্দহীন ভালোবাসা আর গহীন অরণ্যের বুকচেরা জ্যোৎস্না।
সত্যের মতো সে দাঁড়িয়ে থাকে জানালার ধারে বৃষ্টির দুপুরে,
ফুল ছাড়া কোন অলঙ্কার তার নেই, সত্যের কোনো অলঙ্কারের দরকার হয় না।

এই মধ্যরাতে একটি কবিতা হৃৎপিন্ডের মতো স্পন্দিত
হচ্ছে, বেড়ে উঠছে, যেন নানা অলিগলি,
লতাগুল্মময় পথ আর কোন একটি বাড়ির
নিদ্রাতুর ঘরের জানালা-ছুঁয়ে-আসা স্মৃতি।
আমার ভেতরে যখন কবিতা বেড়ে ওঠে মুহূর্তে মুহূর্তে,
দেখি বরহীন বরযাত্রীগণ আর্তনাদ করতে করতে গড়িয়ে পড়ে যান খাদে,-
সে আর্তনাদে গুলিবিদ্ধ রাজহাঁসের ক্রন্দন,
সতীদাহের চোখে-জ্বালা-ধরানো ধোঁয়ার ভয়ৎকর উদ্‌গীরণ-
দেখি একজন ক্ষ্যাপাটে বাঁশি-অলা ফুটপাথে গেরস্থালি
করতে এসে পরিবারসহ ফৌত হয়ে যায় ব্যাপক মড়কে;
নরকের গনগনে ধুম্রজাল ছিঁড়ে
বাতিল ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে আসে
এক অচিন বালক, তার কাঁধে ত্রিকালজ্ঞ পাখি,
মাথায় বর্ণিল পালকের মুকুট।
এখনো মানুষ বালিশে মুখ চেপে ডুকরে ওঠে ব'লেই,
এখনো মানুষ বড়ো একা একা থাকে ব'লেই,
রাতের তৃতীয় প্রহরে কারো আঙুলের ফাঁকে
সিগারেট পুড়ে যায় ব'লেই,
দিনান্তে কিংবা মধ্যরাতে অন্ধকার ঘরে ফিরে কেউ বাতি জ্বালে ব'লেই,
ক্লান্ত পথিক বনবাদাড়ে দিক ভুল করে ব'লেই
মাঝে-মধ্যে টেলিফোন সবচেয়ে সুকন্ঠ পাখির মতে।
গান গেয়ে ওঠে ব'লেই,
গেরস্তের সংসার থেকে কখনো কখনো নিরুদ্দেশযাত্রা আছে ব'লেই,
প্রতিশ্রুতিময় হাতের কাছে আজো হাত এসে যায় ব'লেই,
ম্লান জ্যোৎস্নায় শেষরাতে নৌকো ঘাট ছেড়ে যাত্রা করে ব'লেই,
মনে পর্দায় পলনেস্কির ছবির মতো ভয়াবহতা কম্পমান ব'লেই,

অসুখী বিবাহের মতো নক্ষত্র, ভিখিরীর ন্যাকড়া, ঈগল
আর গুবরে পোকার সম্মিলন আছে ব'লেই,
প্রাচীন মিশরীয় সমাধির চিত্ররাজির মতো স্মৃতি খেলা করে ব'লেই,
এক-গা ভস্ম ঝেড়েঝুড়ে কবিতা জেগে উঠে
মাটির ঠোঁটে চুমো খায় আর বিখ্যাত উড়াল দ্যায় মেঘের মহালে।
আমার অন্তর্গত সরোবরে চুঞ্চ ডুবিয়ে ডুবিয়ে প্রাণ সঞ্চয় করছে যে-কবিতা
তা' অপলক তাকিয়ে থাকে আরেক কবিতার দিকে
এবং সেতুবন্ধের গান গাইতে গাইতে চুম্বন হয়ে চলে যায়
তার দিকে, যার পায়ের কাছে শায়িত শীয়ামিজ বেড়াল,
যার দোরগোড়ায় এক তরুণ তেজী ঘোড়া
রহস্যের ছন্দে গ্রীবা দুলিয়ে দুলিয়ে
কেবলি স্বপ্ন ছড়াচ্ছে সেই কবে থেকে, প্রহরে প্রহরে।

বিপর্যস্ত গোলাপ বাগান

গোলাপ আমাকে দিয়েছে গোলাপ
বৃষ্টিসিক্ত তামস রাত্রিশেষে।
অথচ বিশ্ব বিষকালো আজ
হিংস্র ছোবলে, ভীষণ ব্যাপক দ্বেয়ে।
কাল রাত্তিরে যার পদরেখা
পড়েছে আমার নিঝুম স্বপ্নপথে,
সেকি সক্ষম প্রলেপ বুলোতে
স্মৃতি সংকুল আমার পুরোনো ক্ষতে?
কাজের গুহায় আমি ইদানীং

শুনি মাঝে মাঝে টেলিফোনে যার গলা,
মধ্য বয়সে ম্লান গোধূলিতে
তাকে প্রিয়তমা কখনো যাবে কি বলা?
স্বরচুম্বনে শিহরণ জাগে
অভিজ্ঞ হাড়ে, শিরায় জোনাকি জ্বলে।
সভ্যতা দ্রুত ক্ষয়িষ্ণু হয়,
মানবতা ক্রমে চলেছে অস্তাচলে।
গণবিভ্রমে ভ্রষ্ট জনতা
নতজানু কত মেকী দেবতার কাছে।
ঘোর মরীচিকা, কাঁপে দশদিক
নাৎসী প্রেতের বিকট ঘূর্ণি নাচে।
ধর্মপসারী বুড়ো শকুনের
পাখসাটে আজ ইরান মধ্যভূমি।
ডাগর বর্ষা ডাকে নিরালায়-
স্মৃতির প্রতিমা, এখন কোথায় তুমি?
বিপর্যস্ত গোলাপ বাগান,
পোড়-খাওয়া ডালে বুলবুল !
ভুল লক্ষ্যের দিকে সংকেত
দেখায় দিশারী, ডেকে আনে পিছুটান।
তেহরানে নামে দুপুরে সন্ধ্যা,
যখন তখন ঘাতকের গুলি ছোটে;
হাফিজের আর সাদীর গোলাপ
কবি সুলতানপুরের হৃদয়ে ফোটে।
এবং নাজিম হিকমত পচে
কারাকুঠুরিত পুনরায় দিনরাত
ফুচিক ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়ায়

তোলে গৌরবে মূষ্ঠিবদ্ধ হাত।
নেরুদা আবার শিউরে ওঠেন,
এখনই পঙ্গু ঈগল সাম্যবাদ?
মাদ্রিদ আর চরাচর জুড়ে
লোরকা করেন কৃষ্ণ আর্তনাদ।
শিকারী কুকুর-তাড়িত একাকী
রুশ কবি মৃত তুষার-ধবল ত্রাসে;
নিরুদ্দিষ্ট তার ছায়া আজো
মৌন স্মৃতিতে বার বার ফিরে আসে।
প্রতারিত চোখে দেখি অবিরাম
পথে-প্রান্তরে ছিন্ন মুন্ড দোলে।
নিষ্ফল আমি, কী ফল ফলবে
অবালেই গাছ বজ্রদগ্ধ হ'লে?
ঋতু না ফুরাতে গোলাপ ফুরায়,
মৃত্যু নিয়ত জীবনের প্রতিবেশী।
প্রেত –সৈকতে অদীন ভেলায়
আসবে কি তুমি কান্তা মুক্তবেশী?

রুস্তমের স্বগতোক্তি

কেমন সুর্যাস্ত এলো ছেয়ে চরাচরে, রক্তচ্ছটা
সর্বত্র ভীষণ জ্বলজ্বলে, ধরায় দারুণ জ্বালা
আমার দু'চোখে, আর যেদিকে তাকাই দেখি শুধু
একটি ফ্যাকাশে মুখ, নিষ্প্রভ তরুণ ফল যেন,

ভূলুণ্ঠিত গোধূলিতে। ঝকঝকে বল্লমের মতো,
মনে পড়ে, উঠেছিলো ঝল্‌সে সে ক্রুর রণক্ষেত্রে
সুকান্ত তেজস্বী যুবা। যদিও দূরন্ত যোদ্ধা, তবু
ছিলো না ঔদ্ধত্য কিংবা কর্কশতা কণ্ঠস্বরে তার।
যেমন সে অশ্বারোহণে কি অস্ত্রশিক্ষায় নিপুণ
তেমনি পারদর্শী বাক্য উচ্চারণে, সৌজন্যে ভাস্বর।
শত্রুসংহারের নেশা। যে-বীরের শিরায় শিরায়
অত্যন্ত ফেনিল তার কণ্ঠস্বরে রবাবের সুর
পাখির ওড়ার মতো, কখনো জানিনি আগে;
হায়,
যে অন্ধ কৃষক তীক্ষ্ম কাস্তের আঘাতে স্বপ্নময়,
সাধের ফসল তার কেটে ফেলে অকালে, আমিও
তারই মতো বিভ্রমের মনহুশ ঊর্ণাজালে বন্দী
হয়ে নিজ হাতে ক্ষিপ্র করেছি বিরানা এই বুক,
আমার বয়সী বুক। যে মহল গড়েছি নিয়ত
স্বপ্নে, যখন তা কাছে এলো আসমানী ইশারায়
প্রকৃত নির্মাণ হ'য়ে, নিজেই করেছি তাকে ধু-ধু
ধ্বংসস্তুপ। কেন তাকে দেখামাত্র হৃদয় আমার
হয়নি উদ্বেল পিতৃস্নেহে? নিমেষেই কেন চোখ
হয়নি বিপুল বাষ্পাকুল? তবে কি রক্তের টান
দুর্মর সংস্কার কোনো? শুধু জনশ্রুতি, যুগ যুগ
ধ'রে যা' লালিত আমাদের যৌথ সরল স্মৃতিতে?
কেন তাকে দেখামত্র বর্ম খুলে ফেলে, অস্ত্র রেখে
জড়িয়ে ধরিনি বুক, নিইনি মাথার ঘ্রাণ তার?
তাহ'লে পাঁজরে তার বর্শা-চালনার আগে কেন
কাঁপেনি আমার বুক একরত্তি? কেন এই হাত

মুহূর্তে হয়নি শিলীভূত? জয়মত্ত বীর আমি,
হইনি স্থবির কেন ক্ষণকাল? কেন অহমিকা
রৌদ্রঝলসিত শিরস্ত্রাণ হ'য়ে রইলো সর্বক্ষণ?
ধিক তোকে হে মূঢ় অহমিকা, ধিক।
তাহমিনা,
মিথ্যার অক্ষরে কেন লিখেছিলে বিভ্রান্ত খেয়ালে
প্রতারক পত্র তুমি আঠারো বছর আগে? কেন
পুত্রের পিতাকে রেখেছিলে পুত্রহীন ক'রে, কেন?
তুমিতো জানো না এই হতভাগ্য পিতা পুত্রহীন
হয়েছে দ্বিতীয়বার। তুমিতো জানো না! তাহমিনা
তোমার দুলাল আজ এই বিয়াবানে কী নিষ্প্রাণ
কী নিঃস্পন্দ পড়ে আছে অশ্রুময় ঘাতক পিতার
ফজুল স্নেহের খিমাতলে!
কেন আমি আজ তাকে
মিছেমিছি করি দায়ী? রাখ্শারোহী রুস্তম কি ছুটে
পারতো না যেতে ভুল আত্মজার জন্মের সংবাদ
পেয়ে? কেন সে যায় নি পাঁচ দশ মাস পরে কিংবা
দু'চার বছর পরে? কেন তার রক্তে জাগেনি কল্লোল
সন্তানের অকর্ষণে? কন্যা কি সন্তান নয় তবে?
কন্যার ওষ্ঠে কি হাসি ফোটেনা কখনো কিংবা তার
মাথায় থাকেনা ঘ্রাণ? কন্যা পিতাকে দুই হাতে
ধরে না জড়িয়ে? খেলনার জন্যে করে না আবদানে
কোনোদিন? থাকে না প্রবাসী জনকের প্রতীক্ষায়?
কন্যার শিরায় প্রবাহিত হয় না কি জনকের
সতেজ শোণিত ধারা? অনবোলা পরিন্দা সে-ও তো
যোজন যোজন দূর থেকে উড়ে আসে নীড়ে তার

শাবকের কাছে স্নেহবশে, সন্তান পুত্র কি কন্যা
করে না বিচার। হায়, কোন্ অভিশাপে হে রুস্তম
রণমত্ত অবিচল স্নেহহীন প্রবাদপ্রতিম বীর, তুমি
রেখেছো নিজেকে দূরে এতকাল দয়িতা এবং
সন্তানের কাছ থেকে? কী এমন ক্ষতি হতো কার
যদি এ যুদ্ধের ডঙ্কা স্তব্ধ হতো অনেক আগেই,
যদি দৈববলে আফ্রসিয়াবের রণমত্ততার
হতো অবসান এই সর্বনাশা দ্বৈরথের আগে,
যদি কায়কাউসের জলপাই পাতা উঠতো নেচে
আমার পুত্রের বুকে রুস্তমের মনহুশ বর্শা
উদ্যত হওয়ার আগে? কিন্তু, হায়, তা' হওয়ার নয়।
আমরা ধনুক যাঁর হাতে তিনি নিজস্ব ইচ্ছায়
বাঁকান যতটা আমাদের, ততটাই বেঁকে যাই,
কেউ কেউ মচকাই, কেউবা ভীষণ খান খান।
লাশ নিয়ে বসে আছি,
এখন ভীষণ ক্লান্ত আমি;
ওষ্ঠময় মরুবালি, সারামুখে খুনেলা রেখার
হিজিবিজি, মনে হয় হৃতজ্যোতি প্রবীণ ঈগল
সত্তায় নিয়েছে ঠাঁই। শুধু মাঝে-মাঝে পামীরের
উদাত্ত প্রান্তরেয়ার আলরুরুজের চূড়া থেকে
ভেসে-আসা সোহরার সোহরাব ধ্বনি, যা' আমারই
শূন্য পাঁজরের আর্তনাদ, শুনে কেঁপে উঠি, যেন
মরুর শীতার্ত রাতে আহত নিঃসঙ্গ পুশুরাজ।
এই আমি কতদিন ছাগলের চামড়ার মশক
থেকে ঢেলে আকণ্ঠ করেছি পান ঝাঁঝালো শারাব
ইয়ারের মজলিশে রাত্রির তাঁবুতে। আকৈশোর

মৃগয়াবিলাসী আমি, ছুটেছি অরণ্যে, দীর্ঘশ্বাস-
ময় প্রান্তরের বুকে, কী এক নেশায় বুঁদ হ'য়ে
করেছি শিকার বাঘ, সংখ্যাহীন পাহাড়ি হরিণ।
মাজেন্দারানের পথে লড়েছি সিংহের সঙ্গে আর
হয়েছে নিমেষে দীর্ণ আমার নেজায় ভয়ানক
আতশবমনকারী অজগর; পাথুরে জমিনে,
রেগিস্তানে কত যে মড়ার খুলি প্রত্যহ উঠেছে
বেজে দ্রুত হাওয়া-চেরা রাখশ-এর প্রখর খুরাঘাতে,
সফেদ দৈত্যের প্রাণ করেছি সংহার, গুহাবন্দী
কায়কাউসের আয়ু-রাশ্মি দীপ্র দীর্ঘস্থায়ী
করার উদ্দেশ্যে শত শত খ্যাত গর্বিত বীরের
শিরশ্ছেদ করেছি হেলায় ধূলিগ্রস্ত রণক্ষেত্রে।
শুনিনি এমন যোদ্ধা আছে ত্রিভূবনে, রক্তে যার
জমে না তুষারকণা রুস্তমের রণহুংকারে হঠাৎ।
সোহবার তোর এই বালিমাখা রক্তাক্ত শরীর,
সেই পরাক্রান্ত চিরজয়ী রুস্তমকে আজ স্তব্ধ
ইরান-তুরাণ ব্যাপী অস্তরাগে করেছে ভীষণ
ক্লান্ত ওরে, পরাজিত। মিটেছে আগ্রাসী রণক্ষুধা,
আর নয় দুনিয়া কাঁপানো দামামার অট্টহাসি,
এইতো রেখেছি বর্ম খুলে, পড়ে থাকে তলোয়ার।
সোহরাব ফিরবে না আর;
জানিনা মৃত্যুর পরে,
সে কেমন পটভূমি রয়েছে সাজানো, কোন্ মঞ্চ?
পুনরায় ভাঙবে কি ঘুম কোনো ভোরবেলা খুব
নিঝুম খিমায় স্নিগ্ধ হাওয়ার কম্পনে? শিরস্ত্রাণে
পরবে কি খসে দূরযাত্রী রাঙা পাখির পালক?

নতুন সামানগাঁয়ে যাবো কি আবার গোধূলিতে
কোনোদিন পথশ্রান্ত? প্রাক্তন প্রিয়ার হাত নেবো
তুলে হাতে, দেখবো মেহেদি-নক্‌শা তার করতলে
অথবা রহস্যময় কোনো সুর শুনে মরুদ্যান
ছেড়ে চলে যাবো দূর কুহকিনী নারীর গুহায়?
তুলে নেবো হাতে ফের ভল্ল, গদা, আত্মজ হননে
উঠবো কি মেতে পুনরায়? আঁজলায় নহরের
পানি নিয়ে হবো স্বপ্নাচ্ছন্ন? মৃত্যু শুধু নিরুত্তর
অন্ধকার নাকি আলো ভিন্নতর, জানিনা কিছুই।
তবে আজ জোনাকির
আসা-যাওয়া অন্য মানে প্রায়
আমার নিকট; শোনো রাখ্‌শ, নিত্যসঙ্গী কালশ্রান্ত
হে অশ্ব আমার, নেই অবসর, রাত্রি ছেয়ে আসে,
এখন প্রস্তুত হও, তোমার কেশরগুচ্ছ থেকে
ঝেড়ে ফেলো হাহাকার, আমাদের যেতে হবে দূর
আপন শস্তানে, বইতে হবে প্রিয় সওদা শোকের।
তোমার সওয়ার দুই-একজন মৃত, অন্যজন
জীবন্মৃত; ছোটো, ছোটো নিরন্তর, হে অশ্ব আমার।
আবার দাঁড়াবে এক দুঃখী পুত্রহীন পিতা
নিজের পিতার সামনে, হবে নতজানু তাঁর কাছে,
নাম যার বীর জাল এবং তুষারমৌলি তাঁর
শির; ফিরে যাবে নিজবাসভূমে সেই সওদাগরের
মতো, যে সর্বস্ব তার হারিয়ে ফেলেছে মরুপথে
প্রবল লুণ্ঠনকারী তাতারস্যুর ক্রুর হাতে।
কখনো পাবো না দেখা তবু
নিয়ত খুঁজবো তাকে,

বিদেহী যুবাকে, দিকে দিকে অন্তহীন বিরানায়,
মরীচিকাময় পথে, অন্তর্লোকে যে আমাকে খুঁজে
বেরিয়েছে এতকাল বালিয়াড়ি, দুর্গম প্রান্তর,
শত্রুর শিবির আর ভুবননন্দিত যোদ্ধাসংঘে।
এখন নামুক শান্তি দিগন্তে দিগন্তে রেগিস্তানে,
এখন নামুক শান্তি আলরুরুজের জ্যোৎস্নাধোয়া
চূড়ায়, নামুক শান্তি ইতিহাস-তরঙ্গিত এই
আমূদরিয়ায় আর সামানগাঁয়ের গুলবাগে,
ফলের বাগানে রৌদ্রঝলসিত নহরে নহরে,
দিনান্তে উটের কাফেলায়, হরিণেয় পিপাসায়,
এখন নামুক শান্তি কায়কাউসের ব্যাঘ্রচর্ম
খিমায় এবং আফ্রাসিয়াবের সব অস্ত্রাগারে,
এখন নামুক শান্তি বেবাক তাতারী আস্তনায়,
এখন নামুক শান্তি রণলিপ্সু বিক্ষুব্ধ তুরাণে,
এখন নামুক শান্তি তিমিরান্ধ বিদীর্ণ ইরানে।

সক্রেটিস ১

এ-কথা সবাই জানে গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস
ব্যতিক্রমী মত প্রকাশের দায়ে নিজহাতে বিষ
করেছেন পান কারাগারে। মৃত্যু উঠেছিলো নেচে
যখন সে প্রাজ্ঞ ওষ্ঠে কালো মোরগের মতো, বেঁচে
ছিলেন গৃহিনী তাঁর, ছিলো ছেঁড়াখোঁড়া সংসারের
স্মৃতিচিত্র, হাট-বাজারের সংলাপ, তরুণদের
নিয়ত সত্যাভিসারী দৃষ্টিপাত। তখন কি তাঁর

পড়েছিলো মনে এইসব খুঁটিনাটি? নাকি জগত সংসার
কুটোর মতোই ভেসে গিয়েছিলো তন্দ্রাচ্ছন্ন স্রোতে?
অথচ সহজ ছিলো আত্মরক্ষা; যদি সত্য হ'তে
ফিরিয়ে নিতেন মুখ, তাহলে নিঃশ্বাস নির্বাসনে
যেতনা তখনই, আরো কিছুকাল নিকানো উঠোনে
পড়তো পদচ্ছাপ। সবই অধিবাস্তবের প্রহেলিকা
জেনেও নিলেন হেমলকী স্বাদ অকম্পিত শিখা।

সক্রেটিস ২

এবং সত্যের মুখ দেখেছিলেন ব'লেই তিনি,
সক্রেটিস, সয়েছেন নির্যাতন, অকাতরে পান
করেছেন হেমলক-এই আত্মাহুতির পুরাণ
চিরঞ্জীব; বিশ্বচরাচরে এভাবেই ছিনিমিনি
খেলা খেলে যুগে যেগে পরাক্রান্ত কবন্ধ সমাজ
চক্ষুষ্মনদের নিয়ে। আপোষের ক্লিন্ন যষ্ঠি হাতে
এখানে সেখানে ঘোরা কখনো ছিনো না তাঁর ধাতে,
তাই আজো আমাদের ভাবলোকে তিনি মহারাজ।
তবে কি একাই তিনি নির্ষাতিত নিগৃহীত
খৃষ্টপূর্বকালে? তাঁর সমকালে হয়নি শিকাব
অন্য কেউ দাঁতাল অমানবিক হিংস্র অন্ধতার?
অবশ্যই আরো কেউ কেউ হয়েছেন বলি নিজ
নিজ মত প্রকাশের দায়ে; ইতিহাস আড়ালেই
রেখেছে তাঁদের, তবু তাঁরা সত্যেই অচিনা বীজ।

স্থানীয় সংবাদ

আমার জানালা থেকে দেখি লক্ষ লক্ষ মৃত পায়রা
স্তূপ হয়ে পড়ে আছে চৌদিকে। পাঁচ নিনিটে পাঁচ হাজার
ঝকঝকে মোটরকার গুঁড়িয়ে যায় সড়ক দুর্ঘটনায়।
একটা অগ্নিকুন্ডের ভেতরে পুড়ছে
পলাশী, নবাব সিরাজন্দৌলার মুকুটে
সূর্যাস্তের রক্তবমি ঝলসে ওঠে বারংবার।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তাড়া তাড়া নোট
এক ঝাঁক ক্রুদ্ধ পাখি হয়ে ঠোকরাচ্ছে পথচারীদের;
হাজার হাজার কাঠমোল্লার আকাট হৈ হল্লায়
ডুবে যাচ্ছে প্রগাঢ় উচ্চারণ। শক্তিশালী কবিসংঘ
অষ্টপ্রহর মেতে রয়েছে বাথরুমের দরজা-জানালা, পাইপ,
বেসিন আর কমোড সারাবার কাজে এবং
কুকুরের পাল কবিতা উগরে দিচ্ছে মধ্যরাতে।
রাজনীতিকগণ কুসীদজীবীর কাছে সত্যকে বন্ধক রেখে
মজেছেন ফটকাবাজারের তেজিমন্দিতে।
স্বর্গতন্ত্রের দোহাই পেড়ে
মৃতেরা সোৎসাহে কবর গিচ্ছে জীবিতদের!
ডালের বাটিতে মরা মাছির মতো ভাসছে একদা-সুখী গ্রাম,
বিস্কুটে কামড় দিতে গিয়ে মনে হয় দুঃস্বপ্ন চিবুচ্ছি
আর আমার উদরে ঘুন্টি-অলা গলা ঢুকিয়ে দ্যায়
ইমরুল কায়েসের উট,
যে মেয়েকে চুমো খেতে যাই, তারই মুখে নিমেষে
গজিয়ে ওঠে ফণিমনসার বন,
বাহুমূলে পুরনো উইঢিবি।

খুনখারাবির কাল এখনো হয়নি শেষ, এদিকে
আহত মুক্তিযোদ্ধার বিবর্ণ ক্রাচে ধরেছে ঘুণে।
এবং নবাব সিরাজদ্দৌলা করতলে
নিজের কাটা মস্তক নিয়ে আর্তনাদ করতে করতে ক্রমাগত
হোঁচট খেয়ে চলেছেন বাংলাদেশের নতুন মানচিত্রে।

হে শহর, হে অন্তরঙ্গ আমার

হে শহর, হে প্রিয় শহর, হে অন্তরঙ্গ আমার,
তুমি কি আমাকে পাঠাতে চাও বনবাসে?
নইলে কেন এই উত্তেজনা তোমার সমগ্র সত্তা জুড়ে?
কেন এই আয়োজন, দাঁতে-দাঁত-ঘষা আয়োজন
প্রহরে প্রহরে? হে শহর, তুমি কি বাস্তবিকই
নির্বাসন বরাদ্দ করেছ আমার জন্যে?
হে শহর, হে প্রিয় শহর, হে মোহিনী আমার,
দেখি এখন তুমি আমার চোখে চোখ রেখে
তাকাতে পারো কি না।
এই তো আমি তোমাকে দেখছি পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে,
তোমার চোখ কেন মাটিতে নিবদ্ধ?
কেন এই অস্বস্তির দ্বিধা তোমার চোখে?
তাহলে কি আমি বুঝে নেব যে তোমার চোখ
আমাকে আর চাইছে না?
তাহলে কি আমাকে একথা মেনে নিতে হবে যে,
যে-তুমি আমার শৈশবকে চেটে চেটে বয়স্ক করেছ,
যে-তুমি আমার যৌবনকে ঢেকে দিয়েছ রাশি

রাশি কৃষ্ণচূড়ায়,
যে-তুমি আমার চল্লিশোত্তর আমাকে শাণিত করেছ,
সেই তুমি আমার বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছ মনে-মনে?
হে শহর, হে আমার আপন শহর,
তোমাকে ঘিরে আমার কিছু স্মৃতি কাননবালার মতো গান গায়।
তোমার কি মনে পড়ে না একদা কী দিন রাত্রি ছিল আমার?
আমি তোমার বুকে মাথা রেখে
গলা ছেড়ে গান গাইতাম নির্দ্বিধায় প্রহরে প্রহরে।
আমিই তো ছিলাম প্রথম আবিষ্কারক তোমার সৌন্দর্যের।
তোমার সৌন্দর্যের শপথ, আমার আগে অন্য কেউই
এমন মজেনি তোমার সৌন্দর্যে।
তুমি কি ভুলে গেছ সেসব উথাল-পাথাল মুহূর্ত,
যখন দু'পায়ে তুমি আমাকে আঁকড়ে ধরতে আর আমি
তোমার স্পন্দিত স্তনে মুখ রেখে একটা মদির স্বপ্ন হয়ে যেতাম?
আমার আঙুলের বাঁশি তোমার মাংসের স্তরে স্তরে
সুর জাগিয়ে তুলত, তুমি কি ভুলে গেছ?
তোমার কি মনে পড়ে না
তোমার জন্যে কী অক্লান্ত ছুটে বেড়াতাম সূর্যোদয় থেকে
সূর্যাস্তের দিকে,
যেমন প্রাচীন গ্রিক দেবগণ পশ্চাদ্ধাবন করতেন
সুন্দরীদের প্রান্তরে প্রান্তরে, বন-বনান্তরে?
আহ্ কী দিন রাত্রি ছিল একদা আমার।
তোমার কটিদেশে হিংস্রতার আস্ফালন দেখতে পাচ্ছি।
তোমার আস্তিনের অন্ধকারে কোনো বাঘনখ লুকিয়ে নেই তো?
তোমার ঝলমলে আংটির গহ্বরে ক'ফোঁটা কালো জহর
জমা করে রেখেছ আমার জন্যে?

তোমার মনের অলিগলিতে কোনো দুরভিসন্ধি নেই,
এ-কথা আজ আমি জোরাল কণ্ঠে উচ্চারণ করতে পারছি কই?
শহর, হে প্রিয় শহর আমার, হে বিশ্বাসঘাতিনী
ইদানীং তুমি আমাকে বড় বেশি সন্দেহপ্রবণ করে তুলেছ।
তোমাকে নির্ভয়ে আলিঙ্গন করতে পারছি না আর,
চুম্বন এঁকে দিতে পারছি না তোমার রক্তিম ওষ্ঠে-
এ এক চরম শাস্তি যা আমাকে খাচ্ছে কেবলি।
এই যে তোমার সঙ্গে কথা বলছি এই দারুণ আড়ালে,
কে জানে কেউ আড়ি-পেতে শুনছে কিনা আমাদের এই কথাবার্তা!
কে জানে ক'জন পঞ্চ ব্যঞ্জনপুষ্ট ঘাতক এখন তৈরি হচ্ছে গুপ্ত আস্তানায়,
যেখানে মৃত্যু তার ভোগ নিতে আসে,
যেখানে দাঁড়কাকের মতো কী একটা পাখা ঝাপটায় সর্বক্ষণ
যেখানে হাজার হাজার মৃন্ময় বদনা নরমুন্ড হয়ে নাচে
জ্যোৎস্নায়?
ওরা কোনো যূপকাঠ নির্মাণ করছে কিনা ঘোর অমাবস্যায়,
কে আমাকে বলে দেবে?
বুকের রক্ত ঝরিয়ে
যে-বাগান গড়ে তুলেছি দিনের পর দিন,
তুমি তার প্রতিটি ইঞ্চি তছনছ করে দিয়েছ এক অন্ধ ক্রোধে।
একদা যেসব সুন্দর উপহার তুলে দিয়েছিলে আমার হাতে,
নিজের হাতেই তুমি আজ সেগুলি
ছিনিয়ে নিতে চাও আবার? আমার বুকের মধ্যে
যে রুপালি শহর জেগে থাকে তার আশ্চর্য কলরব নিয়ে,
সেখানে তুমি পাথুরে স্তব্ধতা ছড়িয়ে দিতে চাও
কিসের নেশায় হে শহর আমার, হে ভয়ংকর ভাস্কর?
তোমার কাছে গোলাপ প্রার্থনা করে আমি নতজানু,

তুমি কেন ক্যাকটাস ছুড়ে দাও?
তোমার চোখে দেখছি ফলের সম্ভার, পোকাকীর্ণ শব,
বিবাহবাসর, ঘাসঢাকা গোরস্থান, নবজাতকের তুলতুলে শরীর,
বৃদ্ধের তোবড়ানো গাল, যুবকের মসৃণ চিবুক, মরা মাছ,
উড়ন্ত মরাল, কংকালসার মহিষ, যুবতীর গ্রীবা, পোড়ো বাড়ি,
সতেজ ডালিয়া আর লুটেরার লোভী হাত আর সন্তের চোখ,
হে শহর, হে আমার আদরিণী বেড়াল,
এ তোমার কেমন ঢঙ বলো তো?
যেন তোমাকে আমরা খেতে দিইনি কোনো দিন
সকালবেলার আলোর মতো দুধ,
যেন তোমার নরম পশমে আঙুল ডুবিয়ে বসে থাকিনি
ঘণ্টার পর ঘণ্টা,
যেন তোমার চোখে চোখ রেখে বলিনি মনে রেখো!
হে শহর, হে প্রিয় শহর, হে অন্তরঙ্গ আমার,
তুমি কি সেই ভীষণ দলিলে সই করে ফেলেছ,
যার প্রতাপে আমি কাঁদব দীর্ঘ পরবাসে?
আমার সঙ্গে কোনো ছলাকলার প্রয়োজন নেই,
তুমি অসংকোচে উচ্চারণ করতে পারো নিষ্ঠুরতম ঘোষণা-
আমি রৌদ্রমাখা ধ্বংসস্তূপের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলে যাব
প্রতিবাদহীন, কোনো অভিমানকে প্রশ্রয় না দিয়েই।
তবে যাবার আগে
আমি তোমার সবচেয়ে ভয়ংকর রূপও দেখে নিতে চাই, হে
বিশ্বাসঘাতিনী।
আমি অপেক্ষা করব,
তোমার নীলচক্ষু বৎসদের সকল খেলা গোধূলিতে মিলিয়ে গেলে,
আমি তোমার ওষ্ঠে চুম্বন এঁকে

সৌন্দর্যের ভিতরে মৃত্যু এবং মৃত্যুর ভিতরে সৌন্দর্য দেখে যাব,
আমি সন্তের মতো অপেক্ষা করব উপবাসে দীর্ঘকাল।

৩১৩, তুমি ফিরে এসো

স্বপ্নের ভেতরে পেয়েছি একটি সংখ্যা, তিনশো তের,
৩১৩ হীরের লকেটের মতো দোলে
সারাক্ষণ দৃষ্টিপথে, মায়াবী।
এই সংখ্যা দুলে উঠলেই অজস্র ময়ূর পেখম মেলে
আমার একলা ঘরে, অবিস্মরণীভাবে
গোলাপ বাগান উন্মীলিত হয় মেঝে ফুঁড়ে হঠাৎ,
দেয়াল থেকে বেরিয়ে আসে সিংহাসন।
এই সংখ্যা দুলে উঠলেই
একজন তৃষ্ণার্ত পথিককে দেখি আঁজলা ভ'রে ঝরনা তুলে নিতে,
প্রাচীন গীতে গুঞ্জরিত হয় সত্তা,
নাবিকের নিরাপত্তাময় জলপথে নামে গোধূলি বেলা,
প্রেমিকের ওষ্ঠে ঝরে শত চুম্বন, মধুর, মদির,
বারবার ফিরে আসে বিয়ে বাড়ির চিত্রিত কুলো
আর রঙিন মাটির প্রদীপ।
এই স্বপ্নাদ্য সংখ্যা
কিসের যোগফল কিংবা গুণফল, জানিনা;
অবশ্যই পুণ্যফল মানি।
যখন ৩১৩ রবাবের মতো বাজে
এই শহরের সকল মূকের কণ্ঠ থেকে ঝরে দিব্য সঙ্গীত,
যখন ৩১৩ একটি বাক্যশোভা,

এই শহরের ব্যর্থতম কবির লেখনী হয় সকল কবিতার উৎস,
যখন ৩১৩ নীল নক্ষত্রের মতো জ্বলে,
প্রতিটি পথভ্রষ্ট পান্থজন তার গন্তব্যে পৌঁছে যায়,
যখন ৩১৩ হাতের মতো প্রসারিত হয়,
হতচ্ছাড়া তীরভূমি হয়ে যায় সবচেয়ে সম্পন্ন বন্দর,
নাবিকের গানে আর সুন্দরীদের গুঞ্জনে মুখর,
যখন ৩১৩ মসলিনের রুমালের মতো ওড়ে,
বিশ্বের সবচেয়ে মারাত্মক সংঘর্ষসমূহ যায় থেমে,
যখন ৩১৩ চোখের তারার মতো কাঁপে,
এই শহরের অন্ধ সম্প্রদায় একসঙ্গে ফিরে পায় দৃষ্টি,
এই শহরের সকল নৈরাশ্যবাদী বুকের ভেতর
গান গায় জলকন্যা,
৩১৩ যখন দরবেশের তসবিহ,
ধাবমান ক্ষুধার্ত বাঘ হরিণকে বাগে পেয়েও ছেড়ে দেয়
সীমাহীন নিস্পৃহতায়,
নিষ্ঠুরতম জল্লাদের হত বেহালা হ'য়ে বাজে,
সবচেয়ে বিপজ্জনক চোরাবালি বদলে যায় পার্কে,
ভয়াল ময়াল রঙধনুর বর্ণচ্ছটায়।
এই যে আমি স্বপ্নাদ্য একটি সংখ্যা নিয়ে মেতে আছি,
এই সংখ্যাটিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে
অনেক খানাখন্দে পড়েছি কাঁটাতারে আটকে আমার
হাত-পা হয়েছে জখম, তবু কোনো
কূলকিনারা হয়নি, শুধু রূপসীর হাসির মতো
একটা মরীচিকা আমাকে ডেকে নিয়ে গেছে বারংবার।
কে আমি? কী-ই বা আমি? সেই
চিরকেলে প্রশ্ন করি নিরন্তর নিজেকেই। এখানে

এসেছি কেন? কী কর্তব্য আমার?
আখেরে কোথায় যাবো? এই যে ব'সে থাকি নিশ্চুপ,
চোখ রাখি গাছের মগডালে, শুনি টিকটিকির ধ্বনি,
মাঝে-মধ্যে ভাবি ঐ গাছের বাকল এসে লাগবে আমার শরীরে,
হয়তো আমাকে দেয়াল ভেবে জন্মান্ধজন
উন্নয়নশীল দেশে ঘনিয়ে-আসা দুর্নীতির মতো অন্ধকারে
পথ চলবে। স্বরূপ অন্বেষায় ক্লান্ত আমি
পথের নকশা হারিয়ে ফেলেছি-
কেউ কি আমাকে বলে দেবে অনেক আমির ভিড়ে
কোন্ আমি বাস্তবিকই আমি?
বলে দেবেন কি কোনো যীশু কিংবা শাক্যমুণি?
একপালে ডালকুত্তা-তাড়িত কয়েদী যেমন
ভুলুণ্ঠিত হয়ে খিম্চে ধরে মাটি কিংবা শেকড়বাকড়
তেমনি আমি হাত বাড়িয়েছি সেই আমার
স্বপ্নাদ্য সংখ্যাটির দিকে স্বপ্নাদিষ্ট পুরুষের মতো।
৩১৩ যখন কোনো গুণীর সর্বদা-তরুণ কণ্ঠের তান,
রাজবন্দীগণ দেবদূতের মতো উড়ে যান নীলিমায়
জন্মান্ধ সেল ছেড়ে
লাঞ্ছিত, নির্যাতিত জননেতা ভূষিত হন জয়মাল্যে,
স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্রপুঞ্জে জনগণ বাক-স্বাধীনতা ফিরে পান
অবলীলায়।
৩১৩ তুমি ফিরে এসো আমার চোখের পাতায়,
ফিরে এসো করতলে, ফিরে এসো আমার
স্বপ্নে জাগরণে, যেমন শস্য ফিরে আসে
ভাগ ভাষীর ভাবনায়, দুঃসহ জীবন যাপনে, বুকের ভেতরে,
৩১৩ তুমি ফিরে এসো।

The End

PDF by BDebooks.Com